তিনটি গল্প

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনটি গল্প

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্নর দল
গায়ে হলুদ
তুচ্ছ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্নর দল

পাড়ায় ছ’সাত ঘর ব্রাহ্মণের বাস মোটে। সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পরকে ঠকিয়ে পরস্পরের কাছে ধার-ধোর করে এরা দিন গুজরান করে। অবিশ্যি কেউ কাউকে খুব ঠকাতে পারে না, কারণ সবাই বেশ হুঁশিয়ার। গরিব বলেই এরা বেশি কুচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না বা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না।

আগেই বলেছি, সকলের অবস্থা খারাপ এবং খানিকটা তার দরুন, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারা খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই

মুখে, ছোট ছোট ছেলেরা এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং এমন পাকা পাকা কথা বলে যে, তাদের আর শিশু বা বালক বলে মনে হয় না। কাব্যে বা উপন্যাসে যে শৈশবকালের কতই প্রশস্তি পাঠ করা যায়, মনে হয় সে সব এদের জন্য নয়, এরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একেবারে প্রবীণত্বে পা দিয়েছে।

পাড়ায় একঘর গৃহস্থ আছে, তারা এখানে থাকে না, তাদের কোঠাবাড়িটা চাবি দেওয়া পড়ে আছে আজ দশ-বারো বছর। এদের মস্তবড় সংসার ছিল, এখন প্রায় সবাই মরে হেজে গিয়ে প্রায় পাঁচটি প্রাণীতে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির বড় ছেলে পশ্চিমে চাকরি করে, মেজ ছেলে কলেজে পড়ে কলকাতায়, ছোট ছেলেটি জন্মাবধি কালা ও বোবা—পিসিমার কাছে থেকে মূকবধির বিদ্যালয়ে পড়ে। বড় ছেলে বিবাহ করেনি, যদিও তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হয়েছে। সে নাকি বিবাহের বিরোধী, শোনা যাচ্ছে যে এমনিভাবেই জীবন কাটাবে।

পাড়ার মধ্যে এরাই শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার মানুষ। সেজন্য এদের কেউ ভালো চোখে দেখে না, মনে মনে সকলেই এদের হিংসে করে এবং বড় ছেলে যে বিয়ে করবে না বলছে, সে সংবাদে পাড়ার সবাই পরম সন্তুষ্ট। যখন সবাই ছোট ও গরিব, তখন একঘর লোক কেন এত বাড় বাড়বে? বড় ছেলে বিয়ে করলেই ছেলেমেয়ে হয়ে জাজ্বল্যমান সংসার হবে দুদিন পরে, সে কেউ সহ্য করতে পারবে না। মেজ ছেলে মোটে কলেজে পড়ছে, এখন সাপ হয় কী ব্যাঙ হয় তার কিছু ঠিক নেই, তার বিষয়ে দুশ্চিন্তার এখনো কারণ ঘটেনি, তবে বয়েসও বেশি নয়।

মজুমদার-বাড়িতে ভাঙা রোয়াকে দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে-গজালি হয়। তাতে রায়-গিন্নি, মুখুজ্যে-গিন্নি, চক্কত্তি-গিন্নি প্রভৃতি তো থাকেনই, অল্প-বয়সী বৌয়েরা ও মেয়েরাও থাকে। সাধারণত যেসব ধরনের চর্চা এ মজলিসে হয়ে থাকে, তা শুনলে নারীজাতি সম্বন্ধে লিখিত নানা সরল প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনার সত্যতার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ যাঁর উপস্থিত না হবে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন খুব বড় ধরনের অপটিমিস্ট।

আজ দুপুরে যে বৈঠক বসেছে, তাতে আলোচিত বিষয়গুলো থেকে মোটামুটি প্রতিদিনের আলোচনা ও বিতর্কের প্রকৃতি অনুমান করা যেতে পারে।

বোস-গিন্নি বলছিলেন—আরে বাপু দিচ্ছি তো রোজই, আমার গাছের কাঁটাল খেয়েই তো মানুষ, আমাদের যখন কাঁটাল পাড়ানো হয়, ছেলেমেয়েগুলো হ্যাংলার মতো তলায় দাঁড়িয়ে থাকে—ঘেয়ো কী ভুয়ো এক-আধখানা যদি থাকে তো বলি, যা নিয়ে যা। তোদের নেই, যা খেগে যা। তা কি পোড়ার মুখে কোনো দিন সুবাক্যি আছে? ওমা, আজ আমার মেয়ে দুটো নেবু তুলতে গিয়েছে ডোবার ধারের গাছে,

তা বলে কি না রোজ নেবু তুলতে আসে, যেন সরকারি গাছ পড়ে রয়েছে আরকি —চব্বিশ ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিলে মন্টুর মা। আচ্ছা বলো তো তোমরাই—

মন্টুর মা—যাঁকে উদ্দেশ করে এ কথা বলা হচ্ছিল, তিনি এঁদের মজলিসে কেবল আজই অনুপস্থিত আছেন নইলে রোজই এসে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে সবাই তাঁর চালচলন, ধরন-ধারণ, রীতি-নীতির নানারূপ সমালোচনা করল।

প্রিয় মুখুজ্যের মেয়ে শান্তি—ষোল-সতেরো বছরের কুমারী—তার মায়ের বয়সী মন্টুর মায়ের সম্বন্ধে অমনি বলে বসল—ওঃ, সে কথা আর বোলো না খুড়িমা, কী ব্যাপক মেয়েমানুষ ওই মন্টুর মা। ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখিচি, অমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ক্ষুরে নমস্কার, বাবা বাবা!

ছোট মেয়ের ওই জ্যাঠামি কথার জন্য তাকে কেউ বকলে না বা শাসন করলে না, বরং কথাটা সকলেই উপভোগ করলে।

তারপর কথাটার স্রোত আরো কত দূর গড়াত বলা যায় না, এমন সময় রায়-বাড়ির বড়বৌ হঠাৎ মনে-পড়ার ভঙ্গিতে বললেন—হাঁ, একটা মজার কথা শোনোনি বুঝি। শ্রীপতি যে বিয়ে করেছে, বটঠাকুরের কাছে চিঠি এসেচে, শ্রীপতির মামা লিখেচে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল—শ্রীপতি বিয়ে করেচে!

তারপর সকলেই একসঙ্গে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগল :

—কোথায়, কোথায়?

—কবে চিঠি এলো?

—তবে যে শুনলাম শ্রীপতি বিয়ে করবে না বলেচে।

শ্রীপতির বিয়ের খবরে অনেকেই যেন একটু দমে গেল। খবরটা তেমন শুভ নয়। কারো উন্নতির সংবাদ এদের পক্ষে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব। তাদের যখন উন্নতি হলো না, তখন অপরের উন্নতি হবে কেন? কিন্তু এরপরেই যখন রায়-বৌ মুখ টিপে হেসে আস্তে আস্তে বললেন—বৌটি নাকি বামুনের মেয়ে নয়—তখন সকলে খাড়া হয়ে সটান উঠে বসল, তাদের মরা-মরা ভাবটা এক মুহূর্তে গেল কেটে। একটা বেশ সরস ও মুখরোচক পরনিন্দা আর ঘোঁটের আভাস ওরা পেলে, রায়-বৌয়ের চাপা ঠোঁটের হাসি থেকে।

শান্তি উৎসুক চোখে চেয়ে হাসিমুখে বললে—ভেতরে তাহলে অনেকখানি কথা আছে!

বোস-গিন্নি বললেন—তাই বল! নইলে এমনি কোথাও কিছু নয় শ্রীপতি বিয়ে করলে, এ কি কখনো হয়। কি জাত মেয়েটার? হিঁদু তো?

অর্থাৎ তাহলে রগড়টা আরো জমে। রায়বৌ বললেন—হিঁদুই, মেয়েটা বদ্দি বামুন।

এদেশে বৈদ্যকে বলে থাকে 'বদ্দি বামুন'—এ অঞ্চলের ত্রিসীমানায় বৈদ্যের বাস না থাকায় বৈদ্যজাতির সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারো বিশ্বাস ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্যের সামাজিক স্থান, তারা একপ্রকারের নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ, তার চেয়ে নিচু নয়—আবার কারো বিশ্বাস তাদের স্থান সমাজের নিম্নতর ধাপের দিকে।

শান্তি বললে—বৌয়ের বয়েস কত?

ওঃ, তা অনেক। শুনচি চব্বিশ-পঁচিশ—

সকলে সমস্বরে আবার একটা বিস্ময়ের রোল তুললে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত মেয়ে আইবুড়ো থাকে ঘরে! এ আবার কোথাকার ছোট জাত, রামোঃ। ছিঃ—

শান্তির মা বললেন—তাহলে মেয়ে আর নয়, মাগী বল! পাঁড় শসা—বাপ-মা বুঝি ঘরে বীজ রেখেছিল!

কে একজন মুখ টিপে হেসে বললেন—বিধবা না তো?

চক্কত্তি-গিন্নি বললেন—আগের পক্ষের ছেলেমেয়ে কিছু আছে নাকি মাগীর!

এ কথায় শান্তিই আগে মুখে আঁচল দিয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল—তারপরে বাকি সকলে তার সঙ্গে যোগ দিলে। হ্যাঁ, এটা একটা নতুন ও ভারি মজার খবর বটে, মেয়ে-গজালির কিছুদিনের মতো খোরাক সংগ্রহ হলো। আমচুরি কাঁটালচুরির গল্প একটু একঘেঁয়ে হয়ে পড়েছিল।

ঠিক পরের দিনই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল। শ্রীপতির মেজ ভাই উমাপতি গাঁয়ে এসে বাড়ির চাবি খুলে লোক লাগিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করতে লাগল। তার দাদা বৌদিদিকে নিয়ে শীগ্গির আসবে এবং কিছুদিন নাকি গাঁয়েই বাস করবে। বৌদিদি পাড়াগাঁ কখনো দেখেননি,—গ্রামে আসবার তাঁর খুব আগ্রহ। তার দাদাও কলকাতায় বদলি হবার চেষ্টা করছে।

মেয়ে মজলিসে সবাই তো অবাক। শ্রীপতি কোন্ মুখে অজাতের বউ নিয়ে গাঁয়ে এসে উঠবে। মানুষের একটা লজ্জা-শরমও তো থাকে, করেই ফেলেছিস না হয় একটা অকাজ। এসব কি খিরিস্টানি কাণ্ডকারখানা, কালে কালে হলো কী! আর সে ধিঙ্গি মাগীটারই বা কী ভরসা, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণপাড়ায় বিয়ের বউ সেজে সে কোন সাহসে আসবে।

শ্রীপতি অবিশ্যি বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়িতে আসার বিষয়ে এঁদের মত জিজ্ঞাসা করেনি। একদিন একখানা নৌকো এসে গ্রামের ঘাটে দুপুরের সময় লাগল এবং নৌকো থেকে নামল শ্রীপতি, তার নববিবাহিত বধূ, একটা ছোক্রা চাকর ও দুটি ট্রাঙ্ক ও একটা বড় বিছানার মোট, একটা ঝুড়ি-বোঝাই টুকিটাকি জিনিস। ঘাটে দু-একজন যারা অত বেলায় স্নান করছিল, তারা তখুনি পাড়ার মধ্যে গিয়ে খবরটা সবাইকে বললে। তখন কিন্তু কেউ এলো না, অত বেলায় এখন শ্রীপতিদের বাড়ি গেলে তাদের খেতে বলতে হয়। অসময়ে এখন এসে তারা রান্নাবান্না চড়িয়ে খাবে, সেটা প্রতিবেশী হয়ে হতে দেওয়া কর্তব্য নয়, সুতরাং সে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করবার চেয়ে এখন না যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

কিন্তু রাসু চক্কতি আর প্রিয় মুখুজ্যের বাড়ির মেয়েরা অত সহজেই রেহাই পেলেন না। শ্রীপতি নিজে গিয়ে একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকে বললে—ও পিসিমা, ও বৌদিদি, আপনারা আপনাদের বৌকে হাতে ধরে ঘরে না তুললে কে আর তুলবে? আসুন সবাই। বাধ্য হয়ে কাছাকাছির দু-তিন বাড়ির মেয়েরা শাঁক হাতে, জলের ঘটি হাতে নতুন বৌকে ঘরে তুলতে এলেন—খানিকটা চক্ষুলজ্জায়, খানিকটা কৌতূহলে। মজা দেখবার প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই আছে। ছোটবড় ছেলেমেয়েও এলো অনেকে, শান্তি এলো, কমলা এলো, সারদা এলো।

শ্রীপতিদের বাড়ির উঠোনে লিচুতলায় একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূর থেকে মেয়েটির ধপ্ধপে ফর্সা গায়ের রং ও পরনের দামি সিল্কের শাড়ি দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। সামনে এসে আরো বিস্মিত হবার কারণ ওদের ঘটল—মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখে। কী ডাগর ডাগর চোখ! কী সুকুমার লাবণ্য সারা অঙ্গে। সর্বোপরি মুখশ্রী—অমন ধরনের সুন্দর মুখ এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনো দেখেনি।

সকলে আশা করেছিল গিয়ে দেখবে কালো কালো একটা মোটা-মতো মাগী আধ-ঘোমটা দিয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখল, এক নম্রমুখী সুন্দরী তরুণী মূর্তি...। মুখখানি এত সুকুমার যে, মনে হয় ষোল-সতেরো বছরের বালিকা।

বিকেলে ওপাড়ার নিতাই মুখুজ্যের বৌ ঘাটের পথে চক্কত্তি-গিন্নিকে জিজ্ঞেস করলেন—কী দিদি, শ্রীপতির বৌ দেখলে নাকি? কেমন দেখতে?

চক্কত্তি-গিন্নি বললেন—না, দেখতে বেশ ভালোই—

চক্কত্তি-গিন্নির সঙ্গে শান্তি ছিল, সে হাজার হোক ছেলেমানুষ, ভালো লাগলে পরের প্রশংসার বেলায় সে এখনো কার্পণ্য করতে শেখেনি, সে উচ্ছ্বসিত সুরে বলে উঠলে—চমৎকার, খুড়িমা, একবার গিয়ে দেখে আসবেন, সত্যিই অদ্ভুত ধরনের ভালো।

নিতাই মুখুজ্যের বৌ পরের এতখানি প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না—বুঝতে পারলেন না শান্তি কথাটা ব্যঙ্গের সুরে বলছে, না সত্যিই বলছে। বললেন—কী রকম ভালো?

এবার চক্কত্তি-গিন্নি নিজেই বললেন—না, বৌ যা ভেবেছিলাম তা নয়। বৌটি সত্যিই দেখতে ভালো। আর কেনই বা হবে না বলো শহরের মেয়ে, দিনরাত সাবান ঘষছে, পাউডার ঘষছে, তোমার-আমার মতো রাঁধতে হতো, বাসন মাজতে হতো, তো দেখতাম চেহারার কত জলুস বজায় রাখে।

এই বয়সে তো দূরের কথা, তাঁর বিগত যৌবন দিনেও অজস্র পাউডার সাবান ঘষলেও যে কখনো তিনি শ্রীপতির বৌয়ের পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারতেন না—চক্কত্তি-গিন্নির সম্বন্ধে শান্তির একথা মনে হলো। কিন্তু চুপ করে রইল সে।

বিকেলে এ-পাড়ার ও-পাড়ার মেয়েরা দলে দলে বৌ দেখতে এলো। অনেকেই বললে, এমন রূপসী মেয়ে তারা কখনো দেখেনি। কেবল হরিচরণ রায়ের স্ত্রী বললেন—আর বছর তারকেশ্বরে যাবার সময় ব্যান্ডেল স্টেশনে তিনি একটি বৌ দেখেছিলেন, সেটি এর চেয়েও রূপসী।

মেয়ে-মজলিসে পরদিন আলোচনার একমাত্র বিষয় দাঁড়াল শ্রীপতির বউ। দেখা গেল তার রূপ সম্বন্ধে দু-মত নেই সভ্যদের মধ্যে, কিন্তু তার চরিত্র সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য অবাধে চলেছে।

—ধরন-ধারণ যেন কেমন-কেমন—অত সাজগোজ কেন রে বাপু?

—ভালো ঘরের মেয়ে নয়। দেখলেই বোঝা যায়—

—বাসন মাজতে হলে ও-হাত আর বেশিদিন অত সাদাও থাকবে না, নরমও থাকবে না।

—ঠ্যালা বুঝবেন পাড়াগাঁয়ের। গলায় নেক্লেস ঝুলুতে আমরাও জানি—

—বেশ একটু ঠ্যাকারে। পাড়াগাঁয়ে মাটিতে যেন গুমরে পা পড়ছে না, এমনি ভাব। বামুনের ঘরে বিয়ে হয়ে ভাবছে যেন কী—

—তা তো হবেই, বদ্দি বামুনের মেয়ে, বামুনের ঘরে এসেছে, ওর সাত-পুরুষের সৌভাগ্যি না?

নববধূর স্বপক্ষে বললে কেবল শান্তি ও কমলা। শান্তি ঝাঁজের সঙ্গে বললে—তোমরা কারো ভালো দেখতে পার না বাপু! কেন ওসব বলবে একজন ভদ্দর ঘরের মেয়ের সম্বন্ধে? কাল বিকেলে আমি গিয়ে কতক্ষণ ছিলাম নতুন বৌয়ের কাছে। কোনো ঠ্যাকার নেই, অহংকার নেই, চমৎকার মেয়ে!

কমলা বললে—আমাদের উঠতে দেয় না কিছুতেই—কত গল্প করলে, খাবার খেতে দিলে, চা করলে—আর, খুব সাজগোজ কি করে? সাদাসিধে শাড়ি সেমিজ পরে তো ছিল। তবু খুব ফর্সা কাপড়চোপড়—ময়লা একেবারে দুচোখে দেখতে পারে না—

শান্তি বললে—ঘরগুলো এরই মধ্যে কী চমৎকার সাজিয়েছে! আয়না, পিকচার, দোপাটি ফুলের তোড়া বেঁধে ফুলদানিতে রেখে দিয়েছে—শ্রীপতিদার বাপের জন্মে কখনো অমন সাজানো ঘরদোরে বাস করেনি—ভারি ফিটফাট গোছালো বৌটি—

দিন দুই পরে ডোবার ঘাটে নববধূকে একরাশ বাসন নিয়ে নামতে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। চারদিকে বনে ঘেরা ঝুপসি আধ-অন্ধকার ডোবাটা যেন মেয়েটির স্নিগ্ধ রূপের প্রভায় এক মুহূর্তে আলো হয়ে উঠল, একথা যারা তখন ডোবার অন্যান্য ঘাটে ছিল, সবাই মনে মনে স্বীকার করলে। দৃশ্যটাও যেন অভিনব ঠেকলে সকলের কাছে, এমন একটা পচা এঁদো জঙ্গলে ভরা পাড়াগেঁয়ে ডোবার ঘাটে সাধারণত কালো কালো, আধ-ময়লা শাড়িপরা শ্রীহীনা ঝি-বৌ বা ত্রিকালোত্তীর্ণ প্রৌঢ়া বিধবাদের গামছা-পরিহিতা মূর্তিই দেখা যায়, বা দেখার আশা করা যায়—সেখানে এমন একটি আধুনিক ছাঁদে খোঁপা বাঁধা, ফর্সা শাড়ি ব্লাউজ-পরা, রূপকথার রাজকুমারীর মতো রূপসী, নব-যৌবনা বধূ সজনেতলার ঘাটে বসে ছাই দিয়ে নিটোল সুগৌর হাতে বাসন মাজছে, এ দৃশ্যটা খাপ খায় না। সকলের কাছেই এটা খাপছাড়া বলে মন হলো। প্রৌঢ়ারাও ভেবে দেখলে গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি এই ক্ষুদ্র ডোবার ইতিহাসে।

রায়পাড়ার একটি প্রৌঢ়া বললেন—আ-হা, বৌ তো নয়, যেন পিরতিমে—কিন্তু অত রূপ নিয়ে কি এই ডোবায় নামে বাসন মাজতে! না ও হাতে কখনোই ছাই দিয়ে বাসন মাজা অভ্যেস আছে! হাত দেখেই বুঝেছি।

তার পর থেকে দেখা গেল ঘর-সংসারের যা কিছু কাজ শ্রীপতির বৌ সব নিজের হাতে করছে।

ইতিমধ্যে শ্রীপতির কলকাতায় বদলি হবার খবর আসতে সে চলে গেল বাড়ি থেকে। পাড়ার মেয়েদের মধ্যে শান্তি ও কমলা শ্রীপতির বৌয়ের বড় ন্যাওটা হয়ে পড়ল। সকাল নেই বিকেল নেই, সব সময়েই দেখা যায় শান্তি ও কমলা বসে আছে ওখানে।

পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের মেয়ে, অমন আদর করে কেউ কখনো রোজ রোজ ওদের লুচি-হালুয়া খেতে দেয়নি।

একদিন কমলা বলে—বৌদিদি, তোমার ঘরে কাপড়-মোড়া ওটা কী?

শ্রীপতির বৌ বলল, ওটা এসরাজ।

—বাজাতে জানো বৌদি?

—একটুখানি অমনি জানি ভাই, কিন্তু এ্যাদ্দিন ওকে বার পর্যন্ত করিনি। কেন জানো গাঁয়েঘরে কে কী হয়তো মনে করবে।

শান্তি বলল, নিজের বাড়ি বসে বাজাবে, কে কী মনে করবে? একটু বাজিয়ে শোনাও না, বৌদি!

একটু পরে রায়-গিন্নি ঘাটে যাবার পথে শুনতে পেলেন বাড়ির মধ্যে কে বেহালা না কী বাজাচ্ছে, চমৎকার মিষ্টি। কোনো ভিখিরি গান গাচ্ছে বুঝি? দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুনে তিনি ঘাটে চলে গেলেন।

ঘাটে গিয়ে তিনি মজুমদার-বৌকে বললেন কথাটা।

ওই শ্রীপতির বাড়ি কে একজন বোষ্টম বেহালা বাজাচ্ছে শুনে এলাম। কী চমৎকার বাজাচ্ছে দিদি, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে।

দুপুরের মেয়ে-মজলিশে শান্তির মা বললেন—শ্রীপতির বৌ চমৎকার বাজাতে পারে, এসরাজ না কী বলে, এ রকম বেহালার মতো। শান্তিদের ওবেলা শুনিয়েছিল—

রায়-বৌ বললেন, ও! তাই ওবেলা নাইতে যাবার সময় শুনলাম বটে। সে যে ভারি চমৎকার বাজনা গো, আমি বলি বুঝি কোনো ফকির বোষ্টম ভিক্ষে করতে এসে বাজাচ্ছে।

এমন সময় শান্তি আসতেই তার মা বললেন, ওই জিজ্ঞেস কর না শান্তিকে।

শান্তি বলল, উঃ, সে আর তোমায় কী বলব খুড়িমা, বৌদিদি যা বাজাল, অমন কখনো শুনিনি—শুনবে তোমরা? তাহলে এখন বলি বাজাতে—বললেই বাজাবে।

শান্তি শ্রীপতিদের বাড়ি চলে যাবার অল্প পরেই শোনা গেল শ্রীপতির বৌয়ের এসরাজ বাজনা। অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা রইল না।

চক্কত্তি-গিন্নি বললেন, আহা, বড় চমৎকার বাজায় তো!

সকলেই স্বীকার করল শ্রীপতির বৌকে আগে যা ভাবা গিয়েছিল, সে-রকম নয়, বেশ মেয়েটি।

এসরাজ বাজনার মধ্য দিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শ্রীপতির বৌয়ের সহজভাবে আলাপ পরিচয় জমে উঠল। দুপুরে, সন্ধ্যায় প্রায়ই সবাই যায় শ্রীপতিদের বাড়ি বাজনা শুনতে।

তারপর গান শুনল সবাই একদিন। পূর্ণিমার রাত্রে জ্যোৎস্নাভরা ভেতর-বাড়ির রোয়াকে বসে বৌ এসরাজ বাজাচ্ছিল, পাড়ার সব মেয়েই এসে জুটেছে। শ্রীপতি বাড়ি নেই।

কমলা বলল, আজ বৌদি একটা গান গাইতেই হবে—তুমি গাইতেও জানো ঠিক—শোনাও আজকে।

বৌদি হেসে বলল, কে বলেছে ঠাকুরঝি আমি গাইতে জানি?

—না, ওসব রাখো—গাও একটা।

সকলেই অনুরোধ করল। বলল, গাও বৌমা, এ পাড়ায় মানুষ নেই, আস্তে আস্তে গাও, কেউ শুনবে না।

শ্রীপতির বৌ একখানা মীরার ভজন গাইল।

রাণাজি, ম্যায় গিরধর কে ঘর যাঁহু গিরধর মেরা সাচো প্রিতম্ দেখত রূপ লুভাঁউ।

গায়িকার চোখে-মুখে কী ভক্তিপূর্ণ তন্ময়তার শোভা ফুটে উঠল গানখানা গাইতে গাইতে—শান্তি একটা গন্ধরাজ আর টগরের মালা গেঁথে এনেছিল বৌদিদিকে

পরাবে বলে—গান গাইবার সময়ে সে আবার সেটা বৌয়ের গলায় আলগোছে পরিয়ে দিল—সেই জ্যোৎস্নায় সাদা সুগন্ধি ফুলের মালা গলায় রূপসী বৌয়ের মুখে ভজন শুনতে শুনতে মন্টুর মায়ের মনে হলো এই মেয়েটিই সেই মীরাবাই, অনেককাল পরে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে, আবার সবাইকে ভক্তির গান গেয়ে শোনাচ্ছে।

মন্টুর মা একটু বাইরের খবর রাখতেন, যাত্রায় একবার মীরাবাই পালা দেখেছিলেন তার বাপের বাড়ির দেশে।

তারপর আর একখানা হিন্দিগান গাইল বৌ, এঁরা অবিশ্যি কিছু বুঝলেন না। তবে তন্ময় হয়ে শুনলেন বটে।

তারপর একখানা বেহাগ। বাংলা গান এবার। সকলে শুয়ে পড়ল। শান্তির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। অনেকে দেখল বৌয়েরও চোখ দিয়ে জল পড়ছে গান গাইতে গাইতে—রূপসী গায়িকা একেবারে যেন বাহ্যজ্ঞান ভুলে গিয়েছে গানে তন্ময় হয়ে।

সেদিন থেকেই সকলে শ্রীপতির বৌকে অন্য চোখে দেখতে লাগল।

ওর সম্বন্ধে ক্রমে উচ্চ ধারণা করতে সকলে বাধ্য হলো আরো নানা ঘটনায়। পাড়াগাঁয়ে সকলেই বেশ হুঁশিয়ার, এ কথা আগেই বলেছি। ধার দিয়ে—সে যদি এক খুঁচি চাল কি দু পলা তেলও হয়—তার জন্যে দশবার তাগাদা করতে এদের বাধে না। কিন্তু দেখা গেল শ্রীপতির বৌ সম্পূর্ণ দিলদরিয়া মেজাজের মেয়ে। দেবার বেলায় সে কখনো না বলে কাউকে ফেরায় না, যদি জিনিসটা তার কাছে থাকে। একেবারে মুক্তহস্ত সে বিষয়ে—কিন্তু আদায় জানে না, তাগাদা করতে জানে না, মুখে তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হাসিমুখ ছাড়া তার কেউ কখনো দেখেনি।

শ্রীপতির বৌয়ের আপন-পর জ্ঞান নেই, এটাও সবাই দেখল। পাশের বাড়িতে চক্কত্তি-গিন্নি বিধবা, একাদশীর দিন দুপুরে তিনি নিজের ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন, শ্রীপতির বৌ এক বাটি তেল নিয়ে এসে তাঁর পায়ে মালিশ করতে বসে গেল। যেন ও তাঁর নিজের ছেলের বৌ।

চক্কত্তি-গিন্নি একটু অবাক হলেন প্রথমটা। পাড়াগাঁয়ে এ রকম কেউ করে না, নিজের ছেলের বৌয়েই করে না তো অপরের বৌ।

—এসো, এসো মা আমার এসো। থাক থাক, তেল মালিশ আবার কেন মা? তোমায় ওসব করতে হবে না, পাগলি মেয়ে—

এই পাগলি মেয়েটি কিন্তু শুনল না। সে জোর করেই বসে গেল তেল মালিশ করতে। মাথার চুল এসে অগোছালোভাবে উড়ে এসেছে মুখে, সুগৌর মুখে অতিরিক্ত গরমে ও শ্রমে কিছু কিছু ঘাম দেখা দিয়েছে—চক্কত্তি-গিন্নি এই সুন্দরী বৌটির মুখ থেকে চোখ যেন অন্যদিকে ফেরাতে পারলেন না। বড় স্নেহ হলো এই আপন-পর জ্ঞানহারা মেয়েটার ওপর।

ইতিমধ্যে কমলার বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে সে শ্রীপতির বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল, বৌদিদি, তোমায় কী করে ছেড়ে থাকব, ভাই? মাকে ছেড়ে যেতে কত কষ্ট না হচ্ছে, তত হচ্ছে তোমায় ছেড়ে যেতে।...এই এক ব্যাপার থেকেই বোঝা যাবে শ্রীপতির বৌ এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে গ্রামের তরুণ মনের কী রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পূজার সময় এসে পড়েছে। আশ্বিনের প্রথম, শরতের নীল আকাশে অনেক দিন পরে সোনালি রোদের মেলা, বনশিমের ফুল ফুটেছে ঝোপে ঝোপে, নদীর চরে কাশফুলের শোভা। পাশের গ্রাম সত্রাজিৎপুরে বাঁড়ুজ্যে-বাড়ি পুজো হয় প্রতিবছর, এবারও শোনা যাচ্ছে মহানবমীর দিন তাদের বাড়ি আর বছরের মতো যাত্রা হবে কাঁচড়াপাড়ার দলের।

শ্রীপতির বৌ গান-পাগলা মেয়ে, এ কথাটা এত দিনে এ গাঁয়ের সবাই জেনেছে। তার দিন নেই, রাত নেই, গান লেগে আছে, দুপুরে রাত্রে রোজ এসরাজ বাজায়। গান সম্বন্ধে কথা সর্বদা তার মুখে। শান্তির এখনো বিয়ে হয়নি; যদিও সে কমলার বয়সী। সে শ্রীপতির বৌয়ের কাছে আজকাল দিনরাত লেগে থাকে গান শেখবার জন্যে।

একদিন শ্রীপতির বৌ তাকে বলল, ভাই শান্তি, এক কাজ করবি, সত্রাজিৎপুরে তো যাত্রা হবে বলে সবাই নেচেছে। আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো আর দেখতে পাবে না? তারা কি আর অপর গাঁয়ে যাবে যাত্রা শুনতে? অথচ এরা কখনো কিছু শোনে না—আহা! এদের জন্যে যদি আমরা আমাদের পাড়াতেই থিয়েটার করি?

শান্তি তো অবাক। থিয়েটার? তাদের এই গাঁয়ে? থিয়েটার জিনিসটার নাম শুনেছে বটে সে, কিন্তু কখনো দেখেনি। বলল, কী করে করবে, বৌদি কী যে তুমি বলো। তুমি একটা পাগল।

শ্রীপতির বৌ হেসে বলল, সেসব বন্দোবস্ত আমি করব এখন। তোকে ভেবে মরতে হবে না—দ্যাখ না কী করি।

সপ্তাহখানেক পর শ্রীপতি যেমন শনিবারের দিন বাড়ি আসে তেমনি এলো। সঙ্গে তিনটি বড় মেয়ে ও দুটি ছোট মেয়ে ও চার-পাঁচটি ছেলে। বড় মেয়ে তিনটির ষোলো-সতেরো এমনি বয়স, সকলেই ভারি সুন্দরী, ছোট মেয়ে দুটির মধ্যে যেটির বয়স তেরো, সেটি তত সুবিধে নয়, কিন্তু যেটির বয়স আন্দাজ দশ—তাকে দেখে রক্তমাংসের জীব বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন মোমের পুতুল। ছেলেদের বয়স পনেরোর বেশি নয় কারো। সকলেই সুবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

শান্তি, শান্তির মা এবং চক্কত্তি-গিন্নি তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপতির বৌ ওদের দেখে ছুটে গেল রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে। উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে বলল, এই যে রমা, পিন্টু, তারা, এই যে শিব, আয় আয় সব কেমন আছিস? ওঃ কত দিন দেখিনি তোদের—

রমা বলে ষোলো-সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়েটি ওর গলা জড়িয়ে ধরল, সকলেই ওকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল।

—দিদি কেমন আছিস, ভাই—

—একটু রোগা হয়ে গেছিস দিদি—

—ওঃ, কত দিন যে তোকে দেখিনি—

—দাদাবাবু যখন বললেন তোর এখানে আসতে হবে, আমরা তো—

—আহিরীটোলাতে মিউজিক কম্পিটিশন ছিল—নাম দিয়েছিলাম—ছেড়ে চলে এলাম—

মেয়েগুলোর মুখ, রং, গড়ন শ্রীপতির বৌয়ের মতো। রমা তো একেবারে হুবহু ওর মতো দেখতে, কেবল যা কিছু বয়সের তফাত। জানা গেল মেয়ে দুটির মধ্যে রমা ও তার ছোট সতী, এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে বারো বছরের ফুটফুটে ছেলে শিবু শ্রীপতির বৌয়ের আপন ভাইবোন, বাকি সবই কেউ খুড়তুতো, কেউ জ্যাঠাতুতো ভাইবোন।

ক্রমে আরো জানা গেল শ্রীপতির বৌ এদের চিঠি লিখিয়ে আনিয়েছে থিয়েটার করানোর জন্যে।

পাড়ার সবাই এদের রূপ দেখে অবাক। এসব পাড়াগাঁয়ে অমন চেহারার ছেলেমেয়ে কেউ কল্পনাই করতে পারে না। দশ বছরের সেই ছেলেটির নাম পিন্টু, সে শান্তির বড় ন্যাওটা হয়ে গেল। সে আবার একটা সাঁতার দেবার নীল রঙের পোশাক এনেছে, সিক্ত নীল পোশাক সুগৌর দেহে যখন সে নদীর ঘাটে স্নান করে উঠে দাঁড়ায়—তখন ঘাটসুদ্ধ মেয়েরা, বোস-গিন্নি, মন্টুর মা, শান্তির মা, মজুমদার-গিন্নি ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। রূপ আছে বটে ছেলেটির! শান্তি দস্তুর মতো গর্ব অনুভব করে, যখন পিন্টু অনুযোগ করে বলে, আঃ শান্তিদি, আসুন না উঠে, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? আসুন বাড়ি যাই।

পূজা এসে পড়ল। এ-গাঁয়ে কোনো উৎসব নেই পূজার, গরিবদের গাঁয়ে পূজা কে করবে? দূর থেকে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুজ্যে-বাড়ির ঢাক শুনেই গাঁয়ের মেয়েরা সন্তুষ্ট হয়। ভিনগাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের পূজা দেখবার রীতি না থাকায় অনেকে দশ-পনেরো কি বিশ বছর দুর্গাপ্রতিমা পর্যন্ত দেখেনি। মেয়েদের জীবনে কোনো উৎসব-আমোদ নেই এ গাঁয়ে।

শ্রীপতির বৌ তাই একদিন শান্তিকে বলেছিল, সত্যি কী করে যে তোরা থাকিস ঠাকুরঝি—একটু গান নেই, বাজনা নেই, বই পড়া নেই, মানুষ যে কেমন করে থাকে এমন করে।

বোধ হয় সেই জন্যেই এত উৎসাহের সঙ্গে ও লেগেছিল থিয়েটারের ব্যাপারে।

শ্রীপতিদের বাড়ির লম্বা বারান্দায় একধাপে তক্তপোশ পেতে দড়ি টাঙিয়ে হলদে শাড়ি ঝুলিয়ে স্টেজ করা হয়েছে।

শ্রীপতির বৌ ভাইবোনদের নিয়ে সকাল থেকে খাটছে।

শান্তি বলল, তুমি এত জানলে কী করে, বৌদি।

রমা বলল, তুমি জানো না দিদিকে শান্তিদিদি। দিদি অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে—

শ্রীপতির বৌ ধমক দিয়ে বোনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, নে, নে—যা, অনেক কাজ বাকি, এখন তোর অত বক্তৃতা করতে হবে না দাঁড়িয়ে—

রমা না থেমে বলল, আর খুব ভালো পার্ট করার জন্যেও সোনার মেডেল পেয়েছে...।

যতবার পয়লা বোশেখের দিন আমাদের বাড়িতে থিয়েটার হয়, দিদিই তো তার পাণ্ডা—জানো আমাদের কি নাম দিয়েছেন জ্যাঠামশায়?

শ্রীপতির বৌ বলল, আবার?

রমা হেসে থেমে গেল।

মহাষ্টমীর দিন আজ। শুধু মেয়েদের আর ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে থিয়েটার দেখবে। শুধু মেয়েরাই—সমস্ত পাড়া কুড়িয়ে সব মেয়ে এসে জুটেছে থিয়েটার দেখতে।

ছোট্ট নাটকটি। শ্রীপতির বৌয়ের জ্যাঠামশায়ের নাকি লেখা। রাজকুমারকে ভালোবেসেছিল তাঁরই প্রাসাদের একজন পরিচারিকার মেয়ে। ছেলেবেলায় দুজনে খেলা করেছে। বড় হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরুলেন রাজপুত্র, অন্য দেশের রাজকুমারী ভদ্রাকে বিবাহ করে ফিরলেন। পরিচারিকার মেয়ে অনুরাধা তখন নব-যৌবনা কিশোরী, বিকশিত মল্লিকা-পুষ্পের মতো শুভ্র, পবিত্র। খুব ভালো নাচতে-গাইতে শিখেছিল সে ইতিমধ্যে। রাজধানীর সবাই তাকে চেনে, জানে—নৃত্যের অমন রূপ দিতে কেউ পারে না। এদিকে ভদ্রাকে রাজ্যে এনে রাজকুমার এক উৎসব করলেন। সে সভায় অনুরাধাকে নাচতে-গাইতে হলো রাজপুত্রের সামনে ভাড়া করা নর্তকী হিসেবে। তার বুক ফেটে যাচ্ছে, অথচ সে একটা কথাও বলল না, নৃত্যের মধ্য দিয়ে সংগীতের মধ্য দিয়ে জীবনের ব্যর্থ প্রেমের বেদনা সে নিবেদন করল প্রিয়ের উদ্দেশে। এর পরে কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে পরদিন একা একা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

শ্রীপতির বৌ অনুরাধা, রমা ভদ্রা। ওর অন্য সব ভাই-বোনও অভিনয় করল। শ্রীপতির বৌ বেশভূষায়, রূপে, গলে দোদুল্যমান জুঁইফুলের মালায় যেন প্রাচীন যুগের রূপকথার রাজকুমারী, রমাও তাই, গানে গানে অনুরাধা তো স্টেজ ভরিয়ে দিল, আর কী অপূর্ব নৃত্যভঙ্গি! সতী, রমা, পিন্টুও কি চমৎকার অভিনয় করল, আর কী চমৎকার মানিয়েছে ওদের!

তারপর বহুকাল পরে পথের ধারে মুমূর্ষু অনুরাধার সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা। সে বড় মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য! অনুরাধার গানের করুণ সুরপুঞ্জে ঘরের বাতাস ভরে গেল। চারদিকে শুধু শোনা যাচ্ছিল কান্নার শব্দ, শান্তি তো ফুলে ফুলে কেঁদে সারা।

অভিনয় শেষ হলো, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ি চলে গেল না। তারা শ্রীপতির বৌকে ও রমাকে অভিনয়ের পর আবার দেখতে চায়। শ্রীপতির বৌ ও তার ভাইবোনদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে চক্কত্তি-গিন্নি, শান্তির মা ও মন্টুর মা খেতে বসিয়ে দিলেন আর ওদের চারিধার দিয়ে পাড়ার যত মেয়ে।

ও পাড়ার রাম গাঙ্গুলীর বৌ বললেন, বৌমা যে আমাদের এমন তা তো জানিনে! ওমা এমন জীবন তো কখনো দেখিনি—

মন্টুর মা বললেন, আর ভাইবোনগুলোও কি সব হিরের টুকরো! যেমন সব চেহারা তেমনি গান—

শান্তি তো তার বৌদিদির পিছু পিছু ঘুরছে, তার চোখ থেকে অভিনয়ের ঘোর এখনো কাটেনি, সেই জুঁইফুলের মালাটি বৌদির গলা থেকে সে এখনো খুলতে দেয়নি। ওর দিক থেকে অন্যদিকে সে চোখ ফেরাতে পারছে না যেন।

চক্কত্তি-গিন্নি বললেন, আর কী গলা আমাদের বৌমার আর রমার। পিন্টু অতটুকু ছেলে, কী চমৎকার করল।...

শান্তির মা বললেন, পিন্টু খাচ্ছে না, দেখ সেজ বৌ। আর একটু দুধ দি, কটা মেখে নাও বাবা, চেঁচিয়ে তো খিদে পেয়ে গিয়েছে।...কী চমৎকার মানিয়েছিল পিন্টুকে, না সেজ বৌ?

—একে ফুটফুটে সুন্দর ছেলে...

শ্রীপতির বৌ হাজার হোক ছেলেমানুষ, সকলের প্রশংসায় সে এমন খুশি হয়ে উঠল যে খাওয়াই হলো না তার। সলজ্জ হেসে বলল, জ্যাঠামশায় আমাদের বলেন কিন্নর দল—এখন ঐ নামে আমাদের—

রমা হেসে ঘাড় দুলিয়ে বলল, নিজে যে বললে দিদি, আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমায় তবে ধমক দিলে কেন তখন?

তারা বলল, নামটি বেশ, কিন্নর দল, না? আমাদের শ্যামবাজারের পাড়ায় কিন্নর দল বলতে সবাই চেনে—

রমা বলল, কৃত্রিম গর্বের সঙ্গে—প্রায় এক ডাকে চেনে—হুঁ হুঁ—

তারপর এই রূপবান বালক-বালিকার দল, সকলে একযোগে হঠাৎ খিলখিল করে মিষ্টি হাসি হেসে উঠল।

সতী হাসতে হাসতে বললে—বেশ নামটি, কিন্নর দল, না?

এমন একদল সুশ্রী চেহারার ছেলেমেয়ে, তার ওপর তাদের এমন অভিনয় করার ক্ষমতা, এমন গানের গলা, এমন হাসি-খুশি মিষ্টি স্বভাব, সকলেরই মন হরণ করবে তার আশ্চর্য কী?

মন্টুর মা ভাবলেন, কিন্নর দলই বটে।...

ওদের খেতে খেতে হাসি গল্প করতে মহাষ্টমীর নিশি ভোর হয়ে এলো!

শ্রীপতির বৌ বলল, আসুন, বাকি রাতটুকু আর সব বাড়ি যাবেন কেন? গল্প করে কাটানো যাক।

শ্রীপতি বাড়ি নেই, সে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুজ্যে-বাড়ির নিমন্ত্রণে গিয়েছে, আজ রাত্রের যাত্রা দেখে সকালে ফিরবে। সেই জন্যে সকলে বলল, তা ভালো, কিন্তু বৌমা তোমাকে গান গাইতে হবে!

শান্তি বলল, বৌদি, অনুরাধার সেই গানটা গেও আরেকবার, আহা, চোখে জল রাখা যায় না শুনলে।

শ্রীপতির বৌ গাইল, রমা এসরাজ বাজাল। তারপর রমা ও তারা একসঙ্গে গাইল। একটিমাত্র তেড়ো-পাখি বাঁশগাছের মগডালে কোথায় ডাক আরম্ভ করেছে। রাত ফরসা হলো।

সে মহাষ্টমীর রাত্রি থেকে গ্রামের সবাই জানল শ্রীপতির বৌ কী ধরনের মেয়ে।

কেবল তারা জানল না যে শ্রীপতির বৌ-প্রতিভাশালিনী গায়িকা, সত্যিকার আর্টিস্ট। সে ভালোবেসে শ্রীপতিকে বিয়ে করে এই পাড়াগাঁয়ের বনবাস মাথায় করে নিয়ে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়েছে, যশের আশা, অর্থের আশা, আর্টের চর্চা পর্যন্ত ত্যাগ করেছে। তবু গানের ঝোঁক ওকে ছাড়ে না—ভূতে পাওয়ার মতো পেয়ে বসে—দিনরাত তাই ওর মুখে গান লেগেই আছে, তাই আজ মহাষ্টমীর দিন সেই নেশার টানেই এই অভিনয়ের আয়োজন করেছে।

শান্তি কিছুতেই ছাড়তে চায় না ওকে। বলে, তুমি কোথাও যেও না, বৌদিদি, আমি মরে যাব, এখানে তিষ্ঠুতে পারব না। শান্তি আজকাল শ্রীপতির বৌয়ের কাছে গান শেখে, গলা মন্দ নয় এবং এদিকে খানিকটা গুণ থাকায় সে এরই মধ্যে বেশ শিখে ফেলেছে। কিছু কিছু বাজাতেও শিখেছে। গান-বাজনায় আজকাল তার ভারি উৎসাহ। শ্রীপতির বৌ গান-বাজনা যদি পেয়েছে, আর বড় একটা কিছু চায় না, শান্তির সংগীত শিক্ষা নিয়েই সে সব সময় মহাব্যস্ত।

অগ্রহায়ণ মাসের দিকে বৌয়ের বাড়ি থেকে চিঠি এলো রমা কী অসুখ হয়ে হঠাৎ মারা গিয়েছে। শ্রীপতি কলকাতা থেকে সংবাদটা নিয়ে এলো। শ্রীপতির বৌ খুব কান্নাকাটি করল। পাড়াসুদ্ধ সবাই চোখের জল ফেলল ওকে সান্ত্বনা দিতে এসে।

শান্তি সব সময় বৌদির কাছে কাছে থাকে আজকাল। তাকে একদিন শ্রীপতির বৌ বলল, জানিস শান্তি, আমাদের কিন্নর দল ভাঙতে শুরু করেছে, রমাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, আমার মন যেন বলছে...

শান্তির বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, ধমক দিয়ে বলল, থাক ওসব কী যে বলো বৌদি!

কিন্তু শ্রীপতির বৌয়ের কথাই খাটল।

সে ঠিকই বলেছিল, শান্তি ঠাকুরঝি, কিন্নর দলে ভাঙন ধরেছে।

রমার পরে ফাল্গুন মাসের দিকে গেল পিন্টু বসন্ত রোগে। তার আগেই শ্রীপতির বৌ মাঘ মাসে বাপের বাড়ি গিয়েছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে সেও গেল।

এ সংবাদ গ্রামে যখন এলো, শান্তি তখন সেখানে ছিল না, সেই বোশেখ মাসে তার বিবাহ হওয়াতে সে তখন ছিল মোটরি বাণপুরে, ওর শ্বশুরবাড়িতে। গ্রামের অন্য সবাই শুনল, অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে খাঁটি অকৃত্রিম শোক এ রকম এর আগে কখনো এ গাঁয়ে করতে দেখা যায়নি। রায়-গিন্নি, চক্কতি-গিন্নি, শান্তির মা, মন্টুর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ মেয়েটি কোথা থেকে দুদিনের জন্যে এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অকরুণ, কুটিলভাবে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্তন যে কতখানি, ওই সময়ে গাঁয়ের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেত। ওদের চক্কত্তি-বাড়ির দুপুরবেলায় আড্ডায়, স্নানের ঘাটে শ্রীপতির বৌয়ের কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না।

চক্কত্তি-গিন্নি পেয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশি। শ্রীপতির বৌয়ের কথা উঠলেই তিনি চোখের জল সামলাতে পারতেন না। বলতেন, দুদিনের জন্যে এসে মা আমায় কী মায়াই দেখিয়ে গেল! আমার পেটের মেয়ে অমন কক্ষনো করেনি...আহা! আমার পোড়া কপাল, সে কখনো এ কপালে টেকে!

মন্টুর মামা বলতেন, সে কি আর মানুষ! দেবী অংশে ওসব মেয়ে জন্মায়। নিজের মুখেই বলত হেসে হেসে, ‘আমরা কিন্নর দল খুড়িমা’, শাপভ্রষ্ট কিন্নরীই তো ছিল।...যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, তেমনি গান...ও কি আর মানুষ, মা!

কথা বলতে বলতে মন্টুর মায়ের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ত।

এসবের মধ্যে কেবল কথা বলত না শান্তি। তার বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয়নি, ভেবেছিল বাপের বাড়ি এসে বৌদিদির সঙ্গে অনেকখানি জ্বালা জুড়োবে। পূজার

পরে কার্তিক মাসের প্রথমে বাপের বাড়ি এসে সব শুনেছিল। বৌদিদি যে তার জীবন থেকে কতখানি হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, তা এরা কেউ জানে না। মুখে সেসব পাঁচজনের সামনে ভ্যাজ ভ্যাজ করে বলে লাভ কী? কী বুঝবে লোকে?

বছর দুই পরে একদিনের কথা। গাঁয়ের মধ্যে শ্রীপতির বৌয়ের কথা অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছে। শ্রীপতিও অনেকদিন পরে আবার গ্রামের বাড়িতে যাওয়া-আসা করছে শনিবারে কিংবা ছুটিছাঁটাতে।

শ্রীপতিদের বাড়ি থেকে শান্তিদের বাড়ি বেশি দূর নয়, দুখানা বাড়ির পরেই। শান্তি তখন এখানেই ছিল। অনেক রাত্রে সে শুনল শ্রীপতিদাদাদের বাড়িতে কে গান গাইছে। ঘুমের মধ্যে গানের সুর কানে যেতেই সে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল—

বিরহিণী মীরা জাগে তব অনুরাগে, গিরিধর নাগর—

এ কার গলা? ওর গা শিউরে উঠল। ঘুমের ঘোর এক মুহূর্তে ছুটে গেল। কখনো সে ভুলবে জীবনে এ গান, এ গলা? সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে ওদের রোয়াকে জ্যোৎস্না রাত্রে বসে এই গানখানা বৌদি প্রথম গেয়েছিল! সেই অপূর্ব করুণ সুর, গানের প্রতি মোচড়ে যেন একটি আকাঙ্ক্ষার প্রাণঢালা আত্মনিবেদন! এ কি আর কারো গলার—ওর কুমারী জীবনের আনন্দভরা দিনগুলোর কত অবসর প্রহর যে এ কণ্ঠের সুরে মধুময়!

ও পাগলের মতো ছুটে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

রাত অনেক। কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর পৌঁছেছে। ফুটফুটে শরতের জ্যোৎস্নায় বাঁশবনের তলা পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে।

ঠিক যেন তিন বছর আগেকার সেই মহাষ্টমীর রাত্রির মতো।

শান্তির মা ইতিমধ্যে জেগে উঠে বললেন, ও কে গান করছে রে শান্তি? তারপর তিনিও তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন। শ্রীপতিদের বাড়ি তো কেউ থাকে না, গান গাইবে কে? ওদিকে মন্টুর মা, মণি, বাদল সবাই জেগেছে দেখা গেল।

প্রথমেই এরা সবাই ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শ্রীপতি কখন রাতের ট্রেনে বাড়ি এসেছিল, কেউ লক্ষ করেনি। সে কলের গান বাজাচ্ছে। ওদের সাড়া পেয়ে সে বাইরে এসে বলল, আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে আজ চেয়ে আনলুম ওর গানখানা। মরবার কমাস আগে রেকর্ডে গেয়েছিল।

সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শান্তি প্রথমে সে নীরবতা ভঙ্গ করে আস্তে আস্তে বলল, ছিরুদা, রেকর্ডখানা আর একবার দেবে?

পরক্ষণেই একটি অতি সুপরিচিত, পরম প্রিয়, সুললিত কণ্ঠের দরদ-ভরা সুরপুঞ্জে পাড়ার আকাশ-বাতাস, স্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রিটা ছেয়ে গেল। মানুষের মনের কী ভুলই যে হয়! অল্পক্ষণের জন্যে শান্তির মনে হলো তার কুমারী জীবনের সুখের দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে, যেন বৌদিদি মরেনি, কিন্নরের দল ভেঙে যায়নি, সব বজায় আছে। এই তো সামনে আসছে পূজা, আবার মহাষ্টমীতে তাদের থিয়েটার হবে, বৌদিদি গান গাইবে। গান থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বলবে, কেমন শান্তি ঠাকুরঝি, কেমন লাগল!

সমাপ্ত

গায়ে হলুদ

শ্রাবণ মাসের দিন, বর্ষার বিরাম নেই, এই বৃষ্টি আসছে, এই আকাশ পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে। ক্ষেতে আউশ ধানের গোছা কালো হয়ে উঠেছে, ধানের শীষ দেখা দিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেতে।

পুঁটি সকালে উঠে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখল—চারিদিকে মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। হয়তো বা একটু পরে টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়তে শুরু করে দেবে। আজ তার মনে একটা অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি, সেটাকে আনন্দও বলা যেতে পারে, ছদ্মবেশি বিষাদও বলা যায়। কি যে ঠিক করে না যায় বোঝা, না যায় বোঝানো। আজ তার বিয়ের গায়ে-হলুদের দিন। এমন একটা দিন তার বারো বছরের ক্ষুদ্র জীবনে

এইবার প্রথম এলো। সকালে উঠতেই জ্যেঠিমা বলেছে—ও পুঁটি, জলে ভিজে ভিজে কোথাও যেন যাস নি; আর তিনটে দিন কোনো রকমে ভালোয় ভালোয় কেটে গেলি বাঁচি।

আজ কি বার?—মঙ্গলবার! শনিবার বুঝি বিয়ের দিন। পুঁটির মনে সত্যিই কেমন হয়, আনন্দের একটা ঢেউ যেন গলা পর্যন্ত উঠে আটকে গেল। বিয়ে বেশি দূরে কোথাও নয়, এই গ্রামেই, এমন কি এই পাড়াতেই। এক ঘর ব্রাহ্মণ আজ বছরখানেক হলো অন্য জায়গা থেকে উঠে এসেছেন এখানে, দুখানা বড় বড় মেটে ঘর বেঁধেছেন—একখানা রান্নাঘর। এতদিন ধরে সে সঙ্গিনীদের সঙ্গে সেই বাড়িতে কুল পাড়তে গিয়েছে, সত্যনারায়ণের সিন্নি আনতে গিয়েছে, যখন পাড়ার প্রান্তের ঘন জঙ্গল কেটে সে ভদ্রলোক বাড়ি তৈরী করেন ঘাটে যাবার পথে একেবারে ডান ধারে, তখন সে কতবার ভেবেছে এই ঘন বনের মধ্যে বাড়ি করে বাস করবার কার না জানি মাথাব্যাথা পড়ল।

কে জানত, সেই বাড়িটাই—আজ এক বছর এখনও পোরেনি—তবে শ্বশুরবাড়ি হবে!

কতদূর আশ্চর্যের কথা, কতদূর বিস্ময়ের কথা, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ তারই ক্ষুদ্র জীবনে এমন একটা মহাশ্চর্য ব্যাপার সম্ভব হলো। যখনই সে একথাটা ভাবে তখনই সে সুদ্ধ তার মন সুদ্ধ যেন কতদূরে কোথায় চলে যায়। ওই ভদ্রলোকের একটি মাত্র ছেলে, নাম সুবোধ, তারই সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। সুবোধকে এই সন্ধের আগে তাদের বাড়িতে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেছে—বেশ ফর্সা, লম্বামতো মুখ, এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে, এখনও পরীক্ষার ফল বার হয় নি। আগে আগে, সত্যি কথা বলতে গেলে, সুবোধের মুখ পুঁটি তত পছন্দ করত না। তার দাদার সঙ্গে যতবার এসেছে তাদের বাড়িতে—পুঁটি ভাবত—দেখো না ঘোড়ার মতো মুখখানা। কিন্তু আজকাল আর সুবোধের মুখ ঘোড়ার মতো তো মনে হয়ই না, মনে হয় বেশ চমৎকার মুখ। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে অমন চোখ, অমন রঙ, অমন মুখের গড়ন কার আছে?

রায়েদের পুঁটি সেদিন বলেছিল তাকে—হ্যাঁরে, তুই যে বড় ঘোড়ামুখো বলতিস, তোর অদেষ্টে শেষকালে কিনা সেই ঘোড়ামুখোই জুটল!

পুঁটি মারতে ছুটে গিয়েছিল তার পিছু পিছু।

পুঁটির বাবা গোলার দোরে দাঁড়িয়ে ধান পাড়বার ব্যবস্থা করছে। তার বাবা বেশ চাষীবাসী গেরস্ত। পুঁটিদের বাড়িতে চারটে বড় বড় ধানের আউড়ি আছে, গোলা

আছে একটা। আউড়ি জিনিসটা গোলার চেয়ে অনেক ছোটো, তিন চার বিশ ধান ধরে—আর একটা গোলায় ধরে এক পৌটি অর্থাৎ ষোলো বিশ ধান। তাদেরও ধান আছে গোলা ভর্তি, সব কটা আউড়ি ভর্তি। কলকাতায় চাকরি করে এ পাড়ার হরিকাকা, তিনি মাঝে মাঝে গাঁয়ে এসে পুঁটির বাবাকে বলেন—আর কি রায় মশায়, এ বাজারে তো আপনিই রাজা। গোলা ভর্তি ধান রেখেছেন ঘরে, আপনার মহড়া নেয় কে? কলকাতায় 'কিউতে দাঁড়িয়ে এক সের চাল নিতে হচ্ছে—আর আপনি—

পুঁটি জিজ্ঞেস করেছিল—কিসে দাঁড়িয়ে চাল নিতে হয় বাবা, বলছিল হরিকাকা?

--কে জানে কিসে দাঁড়িয়ে, তুই নিজের কাজ কর, আমি নিজের করি—মিটে গেল।

--তুমি জান না বুঝি ও কথাটার মানে? না বাবা?

--না জেনে তো পায়ের উপর পা দিয়ে এ বাজারে চালিয়ে দিলাম মা। কলিকাতার মুখ না দেখেও তো বেশ চলে যাচ্ছে।

কলকাতায় নাকি মানুষের এক সের চালের জন্য চার ঘণ্টা কোথায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—কিন্তু যে বাড়িতে তার বিয়ে হচ্ছে, তাদের অবস্থা এত ভালো নয়। সুবোধ যদি পাস করে, তবে হরিকাকা ভরসা দিয়েছেন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে ওঁর অফিসে চাকরি করে দেবেন। তা হলে তাকেও কি কলকাতায় গিয়ে বাসায় থাকবে হবে আর সেই কিসে দাঁড়িয়ে রোজ এক সের চাল নিয়ে এসে রাঁধতে হবে? সে বড় কষ্ট—তবে, মানে সুবোধ যদি সঙ্গে থাকে, সে বোধহয় সব রকমই কষ্টই করতে প্রস্তুত আছে।

তাদের ধানের গোলা থেকে ধান পাড়া হচ্ছে, খাবরাপোতা থেকে সীতানাথ কলু আড়তদার এসেছে—ধান কিনে নিয়ে যাবে। বিয়ের খরচপত্র ধান বেচে করতে হবে কিনা।

ওর জ্যেঠিমা বললেন, ও পুঁটি আজ কোথাও বেরিও না। নাপিত ও বাড়ি থেকে হলুদ নিয়ে আসবে, সেই হলুদ গায়ে দিয়ে তোমায় নাইতে হবে। এমন সময় সাধন জেলে এসে ভিজতে ভিজতে উঠোনে দাঁড়াল। হাত জোড় করে মাথা নিচু করে প্রণাম করে বলল, পাতপেন্নাম।

তার বাবা বললে—ও সাধন, বাবা তোমায় ডেকেছি যে একবার। আমার যে কিছু মাছের দরকার এই শনিবারে। কি জানি কেন পুঁটির বুকটা দুলে উঠল। এই

শনিবার—এই শনিবারে তা হলে সত্যিই তার—

সাধন বলল—আজ্ঞে, মাছের যে বড্ড গোলমাল যাচ্ছে। গাঙে কি মাছ আছে? ডুমোর বাঁওড়ের মাছ সব যাচ্ছে কলকাতায়। বিরাশি টাকা দর। এমন দর বাপের জম্মে কোনো কালে শুনি নি রায় মশায়। এক সের পোনা ইস্তক পড়তে পাচ্ছে না। মরগাঙে বাঁধল দিয়েলাম—একদিন কেবল এক সাড়ে এগার সের গজাড় মাছ—

পুঁটির বাবা বিস্ময়ের সুরে বললে—সাড়ে এগার সের গজাড়! এমন কথা তো কখনও শুনি নি—

--অরিবত গজাড় রায় মশায়। মাছের এমন দর, গজাড় মাছই বিক্রি হলো দশ আনা সের।

পুঁটি আর দাঁড়াল না। মাকে এমন আজগুবি খবরটা দিতে ছুটল বাড়ির মধ্যে। বৃষ্টি একটু থেমেছে, একটু বেরুতে পারলে ভালো হতো। তার জীবনে যে একটা আশ্চর্য ব্যাপার হতে চলেছে এ কথাটা কারও সঙ্গে আনন্দ করে বলাও চলে না। বেহায়া বলবে, নিন্দে করবে। কেবল বলা চলে তার সমবয়সী পাঁচি, আর ক্ষেন্তি জেলেনির মেয়ে টুনির কাছে। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার—তার চেয়ে অন্তত সাত বছরের বড় লতিদিদির এখনও বিয়ে হয় নি—অথচ লতিদিকে সবাই বলে সুন্দরী, লতিদির বাপের অবস্থা ভালো। লতিদি লেখাপড়া জানে ভালো। গান করে, ওর বাবা যখন কলকাতা চাকরি করত, তখন লতিদি স্কুলে পড়ত সেখানে। কত বই পড়ে বসে বসে দুপুর বেলা। পুঁটি ভালো লেখাপড়া জানে না, লতিদি একটু ঠ্যাকারে, সে লেখাপড়া জানে না বলে বুঝি আর মানুষ না?

তাকে বলে—তুই বই-টই নাড়িস নে পুঁটি। কি বুঝিস তুই এর আস্বাদ?

পুঁটি হয়তো বলে—এ কি বই বল না লতিদি?

--যা যাঃ, আর বইয়ের খবরে দরকার নেই। শরৎ চাটুজ্জ্যের নাম শুনেছিস? কোথা থেকে শুনবি? তোরা তো শুধু জানিস ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কি করে চিঁড়ে কুটতে হয়। তাই করগে যা—এদিকে কেন আবার?

আচ্ছা, আজ তার লতিদিকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—কই লতিদি, তুমি এত বই পড়ে টড়ে বসে আছ, এতসব নাম জান—কই তোমার তো আজও বিয়ে হলো না। আমার জীবনে এত বড় একটা আশ্চর্যি কাণ্ড তো টুক করে ঘটে গেল। ধানের নিন্দে কর, বাবার গোলায় ধান ছিল বলেই তো আজ—কই তোমাদের তো—তারপর ম্যাট্রিক পাস বর। এ গাঁয়ে পাস করা ছেলে একমাত্র আছে মুখুজ্জেদের

জীবনদা। সে নাকি দুটো পাস—কোথায় চাকরি করছে যেন—যেন ঐ দিকে কোথায়। যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে, সে মুখ্যু নয়। পাসের খবর বেরুবার দেরি নেই—বাবা বলেন, সুবোধ নিশ্চয়ই পাস করবে। হে ভগবান, তাই যেন করো, পাস যেন সে করে, সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে সে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে।

নাপিত এসে বললে—মা ঠাকুরুন, ও বাড়ি থেকে দেখে এলাম। গায়ে হলুদের লগ্ন বেলা দশটার পর। আপনাদের যা দিতে হবে তার আগে দিয়ে দেবেন। গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসবে ও বাড়ি থেকে। কি রকম জিনিসপত্র না জানি আসে। পুঁটির মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। একখানা লাল কাপড় নিশ্চয়ই দেবে। পুঁটির মোটে তিনখানা শাড়ি আর একখানা ডুরে শাড়ি আছে মায়ের বাক্সে তোলা। এবার তার অনেক কাপড় হবে, গহনাও হবে। পাঁচ ভরি সোনা দেবার কথাবার্তা হয়েছে। এতদিন দুটি দুল ছাড়া অন্য কোনো গহনা তার অঙ্গে ওঠেনি—অথচ ও কুমারী মেয়ে লতিদিরই হাতে ছ'গাছা করে চুড়ি, গলায় লকেট ঝোলানো হার, কানে পাশা, হাতে আংটিও আছে। ও থাকত শহরে, সেখানে মেয়েদের চালচলন আলাদা। এ সব পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা কাঁচের চুড়ি ছাড়া আবার কি গহনা পরে? অত পয়সাও নেই তার বাপের। গোলায় দুটো ধান আছে মাত্র, নগদ পয়সা কোথায়। যা কিছু করতে হয়, সে ঐ ধান বেচে।

ভীষণ বৃষ্টি এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ঝড়। রান্নাঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে বকনা বাছুরটা ভিজছে। কচুপাতায় জল জমে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তাদের কৃষাণ বীরু মুচি বলছে—ও দিদি ঠাকরোণ, তা একটু তামাক দ্যাও মোরে, বিয়েবাড়ি যে মনেই হচ্ছে না। দুই-দশ ছিলিম তামাক পোড়বে তবে তো বুঝব যে নগনশা লেগেছে। পুঁটি বিরুকে ধমক দিয়ে বলল—যাঃ, তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। তামাক আমি কোথায় পাব? কাকিমার কাছে গিয়ে চাইগে যা—

একটু বেলা হয়েছে। বাড়িতে অনেক লোক এসেছে বিয়ের জন্য। বিয়েবাড়ির মতো দেখাচ্ছে বটে—কুমোরপুরের কাকিমা, পাঁচঘর মাসিমা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছেন—আজ বেলা এগারোটার সময়ে আরও একদল আসবে, ইস্টিশানে গাড়ি গিয়েছে। মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে নাইতে গেল। কুমোরপুরের কাকিমা যাবার সময়ে তাকে বলে গেল—বাঁড়ুজ্জে বাড়ি পিঁড়ি চিত্তির করতে দিয়ে আসা হয়েছে, দেখে আসিস পুঁটি সে-দুখানা পিঁড়ি হয়েছে কি-না। কাকিমার এটা অন্যায় কথা। তার লজ্জা করে না? নিজের বিয়ের পিঁড়ি নিজে বুঝি সে চাইতে যাবে? এত বেহায়া সে এখনও হয় নি। তার বাবা চন্ডিমণ্ডপ থেকে হেঁকে বললেন—ও পুঁটি হাতায় করে একটু আগুন নিয়ে এসো মা—

চণ্ডিমণ্ডপের দোর পর্যন্ত গিয়ে শুনল ওর বাবা আর এখন অজ্ঞাত লোকের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্তা:

--তাহলে পালকির বন্দোবস্ত দেখতে হয়—

--আজ্ঞে পালকি কোথায় মিলবে? ষোলডুবুরির কাহারপাড়া নির্বংশ। পালকি বইবার মানুষ নেই এ দিগের।

--তবে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসো বনগাঁ থেকে।

--এ কাদা-জলে দশ টাকা দিলেও আসবে না। আসবার রাস্তা কই?

--ওরা বিদেশী লোক। বর আসবার ব্যবস্থা আমাদেরই করে দিতে হবে। বুঝলে না? আমরাই পারছি নে, ওরা কোথায় কি পাবে? হিম হয়ে বসে থেকো না। যা হয় হিললে লাগিয়ে দ্যাও একটা।

--আচ্ছা বাবু, বলদের গাড়িতে বর আনলি কেমন হয়?

--আরে না না। --সে বড় দেখতে খারাপ হবে। সে কি—না না। শুনছি ওরা ইংরিজি বাজনা আনছে। বলদের গাড়ির পেছনে ইংরিজি বাজিয়ে বর আসবে, তাতে লোক হাসবে।

--কেন বাবু তাতে কি? বলদের গাড়িতে কি বর যায় না? একেবারে আপনাদের বাড়ির পেছনে এসে থামবে—সেই তো ভালো।

--বলদের গাড়িতে বর যাবে কেন? সে কি আর ভদ্দরলোকের বর যায়? তা ছাড়া পেছনের ও পথ আইবুড়ো পথ। ওখান দিয়ে বর আসবে না, সামনের তেঁতুল তলার রাস্তা দিয়ে বরকে আনতে হবে। তুমি আজকেই যাও দিকি ষষ্ঠীতলা। সেখানে ক'ঘর কাহার আছে শুনিছি। সেখান থেকেই পালকি আনতে—

--সে যে এখান থেকে তিনকোশ সাড়ে তিনকোশ রাস্তা বাবু। পুঁটি আর সেখানে দাঁড়াল না। সুবোধ বর সেজে আসবে বলদের গাড়িতে? হি –হি—সে বড় মজা হবে এখন। ধুতরো ফুলের মালা গলায় দিয়ে?

দৃশ্যটা মনে কল্পনা করে নিয়েই হাসতে হাসতে পুঁটির দম বন্ধ। --ও তিনু—তিনু রে —শোন শোন একটা মজার কথা—

তিনু চার বছরের খুড়তুতো ভাই। উঠোনের নিচে দিয়েই যাচ্ছে। সে মুখ উঁচু করে ওর দিকে চেয়ে বললে—কি লে ডিডি?

--জানিস? এই আমাদের বাড়ি বর আসবে—

--বল?

--হ্যাঁ-রে। ধুতরো ফুলের মালা পরে বলদের গাড়ি চেপে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে —হি—হি—

তিনু না বুঝে হাসলে—হি—হি—

এই সময়ে ওদের জ্যাঠাইমা বাড়ির ছেলেমেয়েকে ডাক দিলেন—ওরে, সবাই এসে কাঁঠাল খেয়ে যা—ও হিমু, পান্তা ভাত কে কে খাবে ডাক দিয়ে নিয়ে আয়। এক হাঁড়ি পান্তা রয়েছে। সেগুলো কাঁঠাল দিয়ে ওঠাতে হবে। এই যুদ্ধের বাজারে —

পান্তা ভাত ও কাঁঠাল পুঁটির অতি প্রিয় খাদ্য। কিন্তু আজ এখন তার খাবার নাম করার জো নেই—খিদেও পেয়েছিল, ইচ্ছে করলে সে কলসি থেকে কাঁঠাল-বীচি ভাজা আর মুড়ি লুকিয়ে পেড়ে নিয়ে খেতে পারত—কিন্তু সে ইচ্ছে তার নেই। তাতে ভগবান রাগ করবেন। আজকের দিনে সে ভগবানকে রাগাবে না। বেলা বাড়ল। ও বাড়িতে শাঁক ও হুলুর শব্দ শোনা গেল। অবিশ্যি খুব কাছে নয় পুঁটির ভাবী শ্বশুরবাড়ি। তা হলেও শাঁকের শব্দ না আসবার মতো দূরও নয়। ওর খুড়তুতো বোন শ্যামা বললে—ওই শোন দিদি, দাদাবাবুর গায়ে হলুদ হচ্ছে—পুঁটি ধমক দিয়ে বললে—চুপ। মেরে ফেলে দেব। দাদাবাবু কে? -বা-রে, হয়েছেই তো— আর তো দুদিন দেরি—

--না। তা হোক। আগে বলতে নেই। জ্যাঠাইমা তো বলছে?

--কি বলছে?

--বলেছে, আমাদের জামাইয়ের গায়ে হলুদ হচ্ছে—সেখান থেকে তত্ত্ব নিয়ে নাপিত এবার এসে পৌঁছে যাবে—

--না। তা হোক। আগে বলতে নেই।

--আচ্ছা দিদি-দাদাবাবু—ইয়ে সুবোধবাবু পাস করেছে?

--খবর এখনও বের হয়নি।

-আমি ও পাড়ার রাধীদের বাড়ি গিয়েছিলাম এই এট্টু আগে। রাধীর দাদা পাস করেছে, কাল বিকেলে কলকাতা থেকে ওর কাকা খবর দিয়েছে।

--তোর দাদাবাবুর—ইয়ে মানে ওর—দূর, এই কেশববাবুর ছেলের খবর কে পাঠাবে কলকাতা থেকে? ওদের তো কেউ নেই কলকাতায়।

একটু পরে ওদের বাড়িতে শাঁক বেজে উঠল, হুলু পড়ল। নাপিত তত্ত্ব নিয়ে আসছে তেঁতুলতলার পথে, বাড়ি থেকে দেখা গিয়েছে।

পুঁটির বুক আনন্দে দুলে উঠল—জ্যাঠাইমা বলছিলেন, আশীর্বাদ হয়ে গেলেও বিয়ে না হতে পারে, কিন্তু গায়ে হলুদ হয়ে গেলে বিয়ে নাকি আর ফেরে না। এবার তাহলে সেই আশ্চর্য ব্যাপারটা তার জীবনে ঘটে গেল।

কেউ আর বাধা দিতে পারবে না। পাড়াগাঁয়ে কত রকমে ভাঙচি দেয় লোকে। তার বিয়েতেও ভাঙচি দিয়েছিল। বলেছিল, মেয়ের রঙ কালো, মুখ-চোখ ভালো না--লেখাপড়া জানে না—আরও কত কি। কিন্তু সুবোধ—না। ছিঃ, ওর নাম করতে নেই, নাম হিসেবে মনে ভাবতে নেই।

তারপর বাকি অনেকগুলো কি ব্যাপার স্বপ্নের মতো তার চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেল। শাঁকের ডাক, হুলুধ্বনি, মা, কাকিমা, জ্যাঠাইমা তাকে তেল-হলুদ মাখিয়ে দিলেন। গায়ে হলুদের তত্ত্ব এলো লালপেড়ে শাড়ি, তেল-হলুদ, একটা বড় মাছ, এক হাঁড়ি দই। তার সমবয়সী বন্ধু তিনজন খেতে এলো তাদের বাড়ি। তাকে কাছে বসিয়ে কত যত্ন করে মাছ দিয়ে, দই দিয়ে, মা জ্যাঠাইমা কত আদর করে খাওয়ালেন, কত মিষ্টি কথা বললেন। সোনার পিঁড়িতে সিঁদুর দেওয়া হলো, প্রদীপ দেখানো হলো, --যাতে শুন্য ধানের গোলা সামনের ভাদ্র মাসে আউস ধানে অন্তত অর্ধেকটা পুরে যায়। বাবা বলেন, গোলার ধান খালি হয়ে যেত না। মধ্যে কি একটা গভর্নমেন্টের হাঙ্গামা এলো—কেউ গোলায় ধান জমিয়ে রাখতে পারবে না, তাতেই অনেক ধান কর্জ দিতে হলো গ্রামের লোকজনকে।

গায়ে হলুদের তত্ত্বে আরও অনেক জিনিস এসেছিল, খাওয়া-দাওয়ার পরে গাঁয়ের মেয়েরা কেউ কেউ দেখতে এলো—তখন সে নিজেও দেখল। আগে লজ্জায় ওদিকেও সে যায় নি। একটা শাড়ি, একটা ব্লাউজ, সায়া একটা—আলতা, সাবান, আয়না আর গন্ধতেল। এ সব জিনিস তার নিজস্ব। কারও ভাগ নেই এতে। সে ইচ্ছে করে যদি কাউকে দেয় তবেই সে পাবে, নইলে নিজের বাক্সে রেখে দিতে পারে, কারও কিছু বলবার নেই।

সব কাজ মিটতে বেলা দুটো পার হয়ে গেল।

পুঁটির মন ছটফট করছিল, ওপাড়ার লতিদি, হিমি, অন্ন, রাধী—এরা কেউ আসে নি—এদের গিয়ে একবার দেখা দেওয়া দরকার--যাতে তারা বুঝতে পারে যে,

তার গায়ে হলুদের মত আশ্চর্য ব্যাপারটা আজ সত্যিই ঘটে গিয়েছে। আচ্ছা, যখন ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে তাদের বাড়ির দোরে তেঁতুলতলার ওই পথটা দিয়ে, বোধনতলার কাছে পালকি নামিয়ে প্রণাম করে—বাজি পুড়বে, লোকজনের হৈ হৈ হবে—ওঃ সে সময়ের কথা ভাবাও যায় না। দ্যাখে যেন পাড়ার সব মেয়েরা এসে। সে বেড়াতে বেড়াতে গেল মুখুজ্জেদের বাড়ি। মুখুজ্জেগিন্নি ওকে দেখে বললেন---কি রে পুঁটি, আয় মা আয়। গায়ে হলুদ হয়ে গেল? আহা, এখন ভালোয় ভালোয় দু-হাত এক হয়ে গেলে—বোসো মা, বোসো।

একটু পরে লতিকাও হাজির হলো। পুঁটিকে দেখে বললে, ও পুঁটি, তোর আজ গায়ে হলুদ ছিল না: হয়ে গেল? কি তত্ত্ব এলো শ্বশুরবাড়ি থেকে?

মুখুজ্জেগিন্নি বললেন—বোস মা তোরা। লতি, পুঁটির সঙ্গে গল্প কর। একটু চা করে আনি। যাক, ভালোই হলো, আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কী কষ্ট, যে দেয় সে-ই জানে!

পাশের বাড়ির জানালা দিয়ে গাঙ্গুলীদের ছোট বৌ ডেকে বললে—ও কে, পুঁটি নাকি? গায়ে হলুদ হয়ে গেল? তা কই আমাদের একবার বলতেও তো হয়? এই তো বাড়ির পেছনে বাড়ি—

পুঁটি বললে—গেলেন না কেন বৌদি? আমরা তো বারণ করিনে যেতে। শাঁক যখন বাজল, তখনও যদি যেতেন—

লতিকা ভাবলে, পুঁটি ছেলে মানুষ, এ উত্তরটা দেওয়া উচিত হলো না। এখানে ও কথা বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু এর পরবর্তী ব্যাপারের জন্য সে বা পুঁটি কেউ প্রস্তুত ছিল না। গাঙ্গুলীদের ছোট বৌ মুখ লাল করে উত্তর দিলে—কি বললি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? আমরা কখনও গায়ে হলুদ দেখি নি, শাঁকে ফুঁ পড়লে অমনি কুকুরের মতো ছুটে যাব তোমাদের বাড়ি পাতা পাততে। অত অংখার ভালো নারে পুঁটি। তোমার বাপের বড্ড ধানের গোলা হয়েছে না? অমন বিয়ে আমরা কখনও কি দেখিছি জীবনে? ছেলের না আছে চাল, না চুলো—সংসারে মানুষ নেই বলে হাড়ি ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলের বিদ্যে কত, তা জানতে বাকি নেই—এবার তো ম্যাট্রিক ফেল করেছে—

এখানে লতিকা আর না থাকতে পেরে বললে—কে বললে ছোট বৌদি? সুবোধবাবুর পাসের খবর তো পাওয়া যায় নি?

--কেন পাওয়া যাবে না? চিঠি এসেছে ফেল করেছে বলে—ওরা সে চিঠি লুকিয়ে ফেলেছে। বিয়ের আগে ও খবর জানাজানি হতে দেবে না। উনিই হাট থেকে চিঠি

আনেন। পোস্টকার্ডে চিঠি। উনি সন্ধের পর সুবোধদের বাড়ি দিয়ে এলেন। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া—

পুঁটির সামনে সব অন্ধকার হয়ে বিশ্বসংসার লেপে পুছে গিয়েছে। মুখরা দর্পিত ছোট বৌয়ের মুখের কাছে সে কি করে দাঁড়াবে। চেঁচামেচি শুনে মুখুজ্জেগিন্নি হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন, লতিকা ওর হাত ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল। মুখুজ্জেগিন্নি ঘরের মধ্যে এসে চাপা গলায় বললেন—আহা, ছেলেমানুষ—ওর সাধ-আহ্লাদের দিনটাতে অমন করে বিষ ছড়াতে আছে—ছিঃ ছিঃ—দ্যাখ তো মা লতি কাণ্ডটা—

কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট পুঁটির হাত ধরে ততক্ষণ লতিকা বলছে—চল চল পুঁটি তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি—ছিঃ, বৌদির কাণ্ড! ও সব কথা মনে করিস নে, মিথ্যে কথা। চল পুঁটি—ভাই—

লতিকার গলার সুরে ও কথার ভাবে কিন্তু পুঁটির মনে হলো লতিদিও এ খবরটা জানে—কি জানি হয়তও গাঁয়ের সবাই জানে—সে-ই কেবল জানত না এতোক্ষণ। পথে পা দিয়েই লজ্জায় অপমানে সে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলে বললে—লতিদি, আমি কী বলেছিলাম ছোট বৌদিকে?—খারাপ কিছু?

সমাপ্ত

তুচ্ছ

আমি সকালে উঠে কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটছি, এমন সময়ে একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের ছোট্ট মেয়ে রাঙা শাড়ি পরে আমাদের বাড়িতে ঢুকল। আমাদেরই গ্রামেরই মেয়ে নিশ্চয়, তবে একে কোথাও দেখিনি বলে চিনতে পারলাম না। মেয়েটির এই অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছে, ওর কপালে সিদুঁর, হাতে সোনা-বাঁধানো শাখা। শ্যামবর্ণ, একহারা চেহারার মেয়ে। মুখখানি বেশ ঢলঢল, বড় বড় চোখ। কানে সোনার দুল। জিজ্ঞেস করলুম—কার মেয়ে তুই রে?

মেয়েটি সামান্য একটু হেসে মাটির দিকে চোখ রেখে বললে—বিশ্বনাথ কামারের।

--বিশুর মেয়ে? বেশ বেশ। তোর দেখছি বিয়ে হয়েছে এই বয়েসে। কোথায় শ্বশুর বাড়ি?

মেয়েটির খুব লজ্জা হচ্ছিল শ্বশুরবাড়ির কথায়। সে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বললে—নারানপুর।

--কোন নারানপুর? ঘিবে-নারানপুর?

--হ্যাঁ।

--কদ্দিন বিয়ে হয়েছে?

--এই ফাল্গুন মাসে।

--শ্বশুরবাড়ি থেকে এলি কবে?

--পরশু এসেছি কাকাবাবু।

--আচ্ছা যা বাড়ির মধ্যে যা।

গ্রামের মেয়ে বাপের বাড়ি এসেছে, এ-পাড়া ও-পাড়ায় সব বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় স্নেহ হলো খুকিটির উপর। এই গ্রামেরই মেয়ে, আহা!

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি মেয়ের মাঝের ঘরের মেঝেতে চুপ করে বসে আচঁল নিয়ে নাড়ছে। কেউ ওর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, কেউ ওর সঙ্গে কথা বলছে না। প্রথম প্রথম হয়তো কথা বলেছিল মেয়েরা, এখন আর ওর কাছাকাছি কেউ নেই, ও একাই বসে আছে। কামারদের মেয়ে তার সঙ্গে কে কথা বলে বেশিক্ষণ?

আমায় দেখে মেয়েটি বললে—কাকাবাবু ও কিসের ছবি?

--ও আমার ফটো।

--আপনার ছবি?

মেয়েটি এতক্ষণ বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টিতে ঘরের দেওয়ালের কতকগুলো ফটো, সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মেমসাহেব, ক্যালেন্ডারের ছবিগুলোর দিকে চেয়ে দেখছিল।

পল্লীগ্রামের ঘরের দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় বা রেমব্রান্টের ছবি অবিশ্যি টাঙানো ছিল না।

--ও মেমসাহেব কি করছে কাকাবাবু?

--সিগারেট খাচ্ছে।

--ওমা, মেয়েমানুষ সিগারেট খায়?

--মেমসায়েবরা খায়। দেখেছিস কখনো মেমসাহেব?

-হুঁ।

--কোথায়?

রাণাঘাট ইস্টিশানে। আড়ংঘাটা যাচ্ছিলাম। যুগলকিশোর দেখতে। তাই দেখি রেলগাড়িতে বসে আছে। সাদা ধপ ধপ করছে একেবারে।

দেখলুম ও একা বসে থাকলেও দেওয়ালের এই অকিঞ্চিৎকর ছবিগুলো দেখে বেশ আমোদ পাচ্ছে! আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমি আবার ঢুকলাম ঘরে কি কাজে। মেয়েটি সেখানে ঠায় বসে আছে সেভাবেই। ওকে কেউ গ্রাহ্য করছে না বাড়ির মেয়েরা। তাতে ওর কোনো দুঃখ নেই, দিব্যি একা একা বসে আছে। চলেও যায়নি।

ও যে আমাদের ঘরে ঢুকে মেঝের ওপর বসে আছে, এই আনন্দে ও ভরপুর। দিব্যি লাল রঙ দেওয়া মাঝাঘষা মেঝে, ঘরের বিছানা আসবাবপত্র দামী নয়, কিন্তু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে যে শ্রেণীর ছবি, সে তো বলাই হলো। একখানা টেবিল, একটা চেয়ারও আছে। টাটার টেবিল ল্যাম্প আছে একটা। কতগুলো মাটির পুতুল—যেমন : গণেশ-জননী, গরু, হরিণ, টিয়া-পাখি, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি—একটা কাঠের তাকে সাজানো আছে।

গৃহসজ্জার এই সামান্য রূপই ওর চোখে আশ্চর্য ঠেকেছে, খুকির চোখ দেখলে তা বোঝা যায়। আমার কষ্ট হলো ওকে কেউ আদর করে কথা বলছে না। ও সেটা আশাও করেনি। আমাদের গ্রামে তেমন ব্যবহার কামার-কুমোরদের মেয়েদের সঙ্গে কেউ করে না। ওরা ঘরে ঢুকে বসতে পেরেছে, এতেও ওরা অত্যন্ত খুশি হয়েছে।

আমি তেল মেখে নাইতে যাব। নারকেল তেল বের করে মাথায় মাখছি দেখে ও চেয়ে রইল।

আমি বললাম, গন্ধতেল একটু মাখবি খুকি?

মেয়েটি একটু অবাক হয়ে গেল। এমন কথা কেউ ওকে বলেনি, কোনো ব্রাহ্মণ-বাড়ির কর্তা তো নয়ই।

বললে—হ্যাঁ।

--সরে আয় দিকি মা।

তারপর তার দুটি অবাক দৃষ্টিকে অবাকতর করে দিয়ে আমি নিজের হাতে তার মাথায় খানিক গন্ধ তেল ঢেলে দিলাম, খোঁপা-বাঁধা চুলের উপর। ও হেসে ফেললে। অনাদৃতা আদর পেয়ে লজ্জা পেলে।

বললাম—কি রকম গন্ধ?

--চমৎকার কাকাবাবু।

--কি তেল বল দিকি?

--জানি না।

--খুব ভালো গন্ধ তেল।

ভারি খুশি হয়েছে ও।

বললে—আমি তাহলে আসি কাকাবাবু? বেলা হয়েছে—

--এসো মা! আবার এসো একদিন—

চলে গেল খুকি। কতটুকু আর তেল দিলাম ওর মাথায়। কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীর জলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা। সুন্দর দিনটা।

সমাপ্ত